সোমবার, ১৬ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৬

মুম্বইয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু মর্মান্তিক, চাই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত

মুম্বইয়ে কমলা মিলস চত্বরে ছাদের ওপর তৈরি এক রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের যেভাবে মৃত্যু হয়েছে তা ভাবা যায় না। প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে, ওই রেস্তোরাঁয় রাত গভীরে এক মহিলার জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি চলছিল। সে সময়েই আগুন লাগে। আগুন কীভাবে লাগল তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ওই এলাকায় চালু অধিকাংশ রেস্তোরাঁ বা পাব লাইসেন্স প্রাপ্ত নয়। বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠেছে। কমলা মিলস চত্বরেই নাকি এরকম বেআইনি রেস্তোরাঁর সংখ্যা কয়েক ডজন, এখন ওখানে এক রেস্তোরাঁকে কেন্দ্র করে এতবড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটায় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টনক নড়েছে, কর্পোরেশনের অধিকারিকরা অনুসন্ধানে নেমেছেন খতিয়ে দেখতে যে, কোন্ কোন্ রেস্তোরাঁ বা পাব বিনানুমতিতে চলছে। প্রশ্ন হল, এতদিন পুর কর্তৃপক্ষ কী করছিলেন? তারা কি সব জেনেও নীরব ছিলেন? তাছাড়া, এইসব রেস্তোরাঁয় সকলের নাকের ডগায় নাইট ক্লাব চলে। পুলিশি লাইসেন্স ছাড়া কীভাবে মুম্বইয়ে এসব হোটেল, পাব, নাইট ক্লাবে নাচ-গান বা স্ফূর্তি চলে তা কারও অজানা নয়। এখন বড় ঘটনা ঘটায় পুরসভা ও পুলিশ বাধ্য হয়ে তৎপর হয়েছে বেআইনি অংশ ভাঙা শুরু হয়েছে, আসলে এসবই চলছে ঘুষের জোরে। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেবে, এটাই প্রত্যাশা মানুষের।

পাশাপাশি মুম্বইয়ে কমলা মিলস চত্বরে ছাদের ওপর পরপর গজিয়ে উঠল রেস্তোরাঁ, পাব, হোটেল ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে ওখানে অগ্নিনির্বাপনের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া এধরনের কাজে চার পাশে যে খোলা জায়গা রাখার নিয়ম রয়েছে তাও মানা হয়নি। এভাবে কমলা মিলস চত্বরে ৩৬টি রেস্তোরাঁ তৈরি হয়ে গেল। বিএমসি অর্থাৎ পুরসভা কী করছিল। এতে স্পষ্ট যে সর্ষের মধ্যেই ভূত। সুতরাং এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে, এটাই কাম্য। একই সঙ্গে দোষীদের শাস্তি দরকার।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ধনবান, কারু চাকরী করতে হয় না! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন?
ডাক্তার—খুব ভাল!
শ্রীরামকৃষ্ণ— আর ইনি—
ডাক্তার—আহা! মহিমাচরণ—হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না— বুঝতেও পারে না।
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— কি তিন পথ তুমি বলো?
মহিমা—সংপথ—জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে। আনন্দ পথ—ভক্তিপ্রেমের পথ। —আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার—আপনি তিন পথেরই খপর বাত্‌লে দেন! (ঠাকুর হাসিতেছেন)।
"আমি আর কি বলবো? জনক বক্তা শুকদেব শ্রোতা!"
ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পর
সমাধিস্থ—নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র— 'জপাৎ সিদ্ধি'

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক। ঠাকুর **সমাধিস্থ!** দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

(৬) হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে!
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে।।
শ্রীরামকৃষ্ণ—আর **'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়!'** ডাক্তার—আহা! গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধ প্রায় হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, "তবে আজ যাই, — আবার কাল আসবো।"
শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু থাকো না! গিরিশ ঘোষকে খপর দিয়েছে। (মহিমাকে দেখাইয়া) ইনি বিদ্বান্ হরিনামে নাচেন, অহঙ্কার নাই। কোন্নগরে চলে গিছলেন— আমরা গিছলাম বলে ; আবার স্বাধীন,

দিনপঞ্জিকা

১৬ পৌষ, ভাঃ ১১ পৌষ, **১ জানুয়ারী**, ১৬ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ সুদি,১৩ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৯। **সোমবার**, চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ১১।১৫ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।১০ মিঃ। শুক্লযোগ দিবা ঘ ১০।৮ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ১১।১৫ গতে বিষ্টিকরণ,'রাত্রি ঘ ১০।৪ গতে ববকরণ। **জন্ম**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ৩।১০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**— দোষ **নাই**। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৪২ গতে ৯।২ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।০ গতে ১১।৪১ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ঘ ৭।৩৯ গতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১১।১৫ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।১০ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ১১।১৫ মধ্যে দীক্ষা। **বিবিধ**— চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও পুণিমার একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১১।১৫ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **পূর্ণিমার নিশিপালন।** সায়াহ্নে নিষেধ। **প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৪।৫৯ গতে রাত্রি ঘ ৬।৩৫ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। ইংরাজী নববর্ষ। নিউইয়ার্স ডে। পূর্ব্বরাত্রি ১২টার পর হইতে ইংরাজী ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ আরাম্ভ। কাশীপুর উদ্যানবাটী ও দক্ষিনেশ্বর কালীমন্দিরে কল্পতরু উৎসব ও পূজা এবং ভক্ত সমাগম ও নানা অনুষ্ঠান। কাশীপুর মহাশ্মশানে ও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সারাদিনব্যাপী পূজা ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপন। অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৪৯ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ পৌষ, ভাঃ ১১ পৌষ, ১ জানুয়ারী, ১৬ পুহ,১৩ রবি সানি। উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৯ সোমবার, চতুর্দ্দশী দিঃ ঘঃ ১১।১৫

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

বনফুলের ছোটগল্প ঃ কালের দৃষ্টিভঙ্গি

পার্থসারথি হাটী
পর্ব-৩

'বাম', 'সুলেখার ক্রন্দন', 'অধরা', 'অক্ষমের আত্মকথা' প্রভৃতি গল্পগুলির গঠন বিন্যাস একটি আর একটিকে সমগ্রভাবে চিনিয়ে দেয়। শেষ স্তরের নাটকীয়তাই এই গল্পগুলির মূল মোচর। আবার লোকসাহিত্যের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যায় এগুলি যেন এক একটি গদ্যাত্মক হেঁয়ালী, ধাঁধাঁ। নাম গোপন করে এক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন কেন্দ্রিক নানান তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। যা শ্রোতারা ভাবছে ফটকে নয়তো জগা কিংবা পাড়ার কোন মাদাপ বখাটে ছোঁড়ার কাহিনী। অবশ্য পরের কুখ্যাত ও বিখ্যাত লোকটির নাম বললেন বক্তা—হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও। নাম ধাম গেল। Suspence শেষ। গল্পও শেষ। এমনি ধাঁধার সেই প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে শ্রোতাতের আস্ত বোকা বনে যাওয়া আর বক্তা সকলকে I hate you all বলে নিজের বুদ্ধির তারিফ পেল। 'সুলেখার ক্রন্দন' গল্পটিও এই একই ছাঁচে গড়া। সুলেখার কান্না, তাও গভীর রাত্রে সে সুন্দরী ষোড়সী নয়ন পল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হতে পারে প্রথমে মনে হলো অমলার মতো সুলেখা মেসে নিয়েছে বিপিনের বিপিনত্ব। কিন্তু আজ হয়তো তার প্রথম প্রেমের সেই অকপময় মনে পড়েছে। কিম্বা হতে পারে মাস দুই পূর্বে মারা যাওয়া প্রথম সন্তানের শোকের কারণে এ আশ্রসঞ্চার সুলেখার কিম্বা হতে পারে এই ক্রন্দন সিনেমা ঘটিত। নয়তো কাপড়ের পাড় পছন্দ নিয়ে বিপিনের সঙ্গে সুলেখার অশান্তিই সুলেখার ক্রন্দনের কারণ। এতোকিছু হতে পারে দিয়ে সে Suspence গল্পকার রচনা করেছেন তা যদি পাঠকের জানা হয়ে যায় যে এগুলোর কোনটাই না হয়ে অন্যকিছু একটা ধাঁধার উত্তর মেলার মতো হবে, তবে নাটকীয়তার তোড়জোড় মাঠে মারা যায়। এখানেও দেখা গেল সুলেখার ক্রন্দন আসলে তার দাঁতের ব্যথার কারণে। আবার যদি বলি, দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না, সেটা কি? —সেটা অধরা। অধরা কি?—স্বপ্ন। এইভাবেই গড়ে ওঠে অধরা গল্পের কাহিনী। কিংবা 'অক্ষমের আত্মকথা' গল্পে প্রেমিকের বিরহ যন্ত্রণা Climax এর স্তর স্পর্শ করার পর জানতে পারছি যে, ব্যর্থতার জন্য দায়ী তারই অক্ষমতা, অর্থাৎ সে একটা বালিশ। গল্পের অংশ এখানেই শেষ বা শেষাংশই যেন অক্ষমের গল্প।

বনফুলের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেউ পুরোপুরি ভগবানও নয়, আবার কেউ পুরোপুরি শয়তানও নয়। সকলেই মানব সত্ত্বার অংশীদার। কিন্তু চরিত্রগুলির মধ্যে তেমন দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। আবার কোন কোন চরিত্রের মধ্যে সে সুযোগ থাকলেও উল্লেখযোগ্যভাবে সংঘাতের তীব্রতা কাহিনীর নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেনি। সামান্য পরিসরের মধ্যে, কোথাও বা একটি বাক্যের মধ্যে গল্পের চূড়ান্ত পরিণতির ভার নির্দিষ্ট করতে গিয়ে চরিত্রকে তার মতো করে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। ধরা যাক 'জৈবিক নিয়ম' গল্পটির কথা। 'সেদিন প্লাটফর্মে রোগা গোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও যাহা করিতেছিল, তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তিকেই শুধু প্রত্যক্ষ করলেন; ছোকরাটির মধ্যে সাধারণ কিছু দেখলেন না—এখানেই নতুন খাতে কাহিনীর বয়ে যাওয়ার ধারাটি অবরুদ্ধ হলো এবং চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের অপমৃত্যু ঘটলো। এরপর বোঝাই যায় গল্পকারের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে গল্প এগিয়ে যাবে গল্পকারের হাত ধরেই। তাই ছোকরার মনোগত উদ্দীপনার স্তরটিকে নেহাত হাসির পর্যায়ে নামিয়ে এনে, জীবন স্তরটিকে কৃশতায় পর্যবসিত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত নায়িকার জন্য পরের ট্রেন মজুত রাখলেন। ছোকরা আগত ট্রেনে জিনিসপত্র তুলে আবার নেমে এলে। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে 'চাকার নিচে পড়িয়া গেল। আর কিছু করিবার সুযোগ পাইল না' বনফুলের হাতেই যেন এখানে অমোঘ নিয়তি। অসহ্য বাহাদুরির শেষ শাস্তিটি যেন গল্পকারের অভিভাবকত্ব থেকেই বেরিয়ে এল, যৌবনের প্রকাশ তত্ত্ব থেকে নয়। ছোকরা ও তরুণীর হৃদয় সংঘাতের কোন সুযোগ লেখক দিলেন না। 'পরিবর্তন' গল্পের সরমা, 'অমলা' গল্পের অমলা, 'নিমগাছ' গল্পের গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটা এরা কেউই প্রতিবাদ করতে জানে না। চরিত্রগুলি বর্ণবিতিত হয় না। তারা একজায়গায় দাঁড়িয়েই নিজেদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুণ্ঠরোগীর বউ' যেখানে বউ পরিচয়ের বাইরে গিয়ে নারী হয়ে বাঁচতে চেয়েছে, 'পরিবর্তন' গল্পে সরমা সেখানে স্বামীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা জেনে নিজে বাঁচতে না চেয়ে যক্ষ্মাক্রান্ত স্বামীর খাওয়া উচ্ছিষ্ট দুধ পান করেছে।—'উনি যদি না বাঁচেন, আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও'। বনফুলের নারী চরিত্রগুলি সঙ্কটিত অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়েও শিকড় ছিন্ন হওয়ার পুরুষতান্ত্রিক ভয়কে মনে মনে লালন করেছে। দেওয়াল ও পিঠের অবস্থান যতটা কাছাকাছি হলে মনের মধ্যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঝড় ওঠে, প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি ততটা অনুকূল থাকলেও বনফুলের নিজস্ব বিশ্বাস সংস্কার ও আদর্শবোধ তা হতে দেয়নি। কিছু বিবর্তন বা পরিবর্তন সেক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। 'ছোটলোক' গল্পে অহংকারী দাম্ভিক রাঘব সরকারের অহেতুক করুণা-কাতরতাকে টিট প্রতিবাদে প্রত্যাঘাত করেছে সমাজের ছোটলোক শ্রেণীভুক্ত একজন রিক্সাওয়ালা। রাঘব সরকার রিক্সায় না চড়েই যখন গন্তব্যস্থল পর্যন্ত রিক্সাওয়ালাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাড়া হিসাবে ছয়টি পয়সা তাকে দিতে যায় তখন 'লোকটার চোখেমুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল'। আমি কারো কাছ থেকে ভিক্ষে নিইনা।' এই প্রতিরোধী মানসিকতায় রয়েছে শ্রেণী দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে প্রতিবাদ ও চেতনার উর্ধ্বায়ণ। 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে সাহেবসাজা বিনাটিকিটের বাঙালি ভদ্রলোককে বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য যখন বাঙালি জাতির প্রতি কটূক্তি করছেন তখন সামন্ত মশাই বাঙালি ভদ্রলোকের টিকিটের দাম মিটিয়ে দিয়েছে। এখানে প্রতিবাদ আছে বটে তা সামন্ত মশাইয়ের ঘুম নষ্টকারী চিৎকার চেঁচামেচির বিরুদ্ধে, না বাঙালি জাতির সম্মানহানিকর কটূক্তির বিরুদ্ধে—তা বেশ বোঝা যায় না।

বনফুলের সৃষ্ট মানসিকতার সঙ্গে দেহাতি জীবনের মিলমিশ সেভাবে হয়নি। তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবুর দুর্গাকে চুমু খাওয়ার বিষয়টি বনফুল কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। বনফুল চিঠিতে তারাশঙ্করকে জানিয়েছিলেন 'আমরা Photographer নই আমরা আর্টিস্ট।' অর্থাৎ জীবন যেমন তার হুবহু রূপদান শিল্পীর কাজ নয়, সে কাজ Photographer এর।

এ ভাবে ভাবলে কিছু কিছু ছোট গল্পে বনফুলকে Photographer বলাই সমীচিন। আসলে তাঁর অর্জিত রুচি পছন্দ, যৌন জীবনের স্পষ্ট বিশ্লেষণে ছুঁত মার্গী। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখি এই ছুঁত মার্গীতাই তাঁর গল্পকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'বধূনী' গল্পে গল্পকার শিশুঘাতী জংলী বিল্টুর পাশবিকতার প্রতি কোনো সহানুভূতি রাখেননি। কারণ বিল্টুর আদিম জৈবিক মনস্তত্ত্বে।

এক 'এক দেশ-এক কর'-এর দেশে

অনিন্দ্য ভুক্ত
পর্ব-১

সব মিলিয়ে তার মানে দাঁড়ায়, কর রাজস্বের ব্যাপারে সরকারকে মোট তিনটি ধাপের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়—আরোপ, আদায় ও বণ্টন এবং এই তিনটি ধাপকে একত্র করে মোট পাঁচটি শ্রেণিতে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত করগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণিগুলি এই রকম—(১) আরোপ, আদায় ও ভোগ করবে কেন্দ্র, (২) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, আবণ্টিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে, (৩) আরোপ ও আদায় করবে কেন্দ্র, পাবে রাজ্য, (৪) আরোপ করবে কেন্দ্র, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য এবং (৫) আরোপ, আদায় ও ভোগ করবে রাজ্য। এই যে পাঁচটি শ্রেণি, এই শ্রেণিগুলিতে বিন্যস্ত করা হয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অধিকারে আছে যে করগুলি, সেগুলিকে। এর বাইরে কিছু কর আছে যেগুলি আরোপ, আদায় ও ভোগ, সবই করে পঞ্চায়েত বা পুরসভার এতো স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলি।

যে পাঁচটি শ্রেণির কথা বলা হল, তার মধ্যে প্রথম শ্রেণিটির অস্তিত্ব অবশ্য এখন আর নেই। এই তালিকায় দু'টি কর ছিল, কোম্পানি কর ও বহিঃশুল্ক। এই দু'টি করকে ২০০০ সালের মার্চ মাসে সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আরোপ থেকে ভোগ, সবটাই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের হাতে থাকবে এমন কোনও কর আর নেই।

ভারতের কর কাঠামো

কর দু'ধরনের, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কর মানে যে করের বোঝা নিজের ঘাড় থেকে অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায় না। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে আয় করে সেই আয়ের উপর তাদের কর দিতে হয়। এই সব কোনওভাবেই অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায় না। আয়কর বা কোম্পানি কর তাই প্রত্যক্ষ করের নমুনা। অন্যদিকে পণ্য ও পরিষেবার উপর যে কর আরোপ করা হয় তা পরোক্ষ করের নমুনা। এনাদিকে পণ্য ও পরিষেবার উপর যে কর আরোপ করা হয় তা পরোক্ষ করের নমুনা। পরোক্ষ কর সহজেই অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায়। কেউ কোনও পণ্য বিক্রি করলে তাকে বিক্রমূল্যের উপর কর দিতে হয়, যাকে বিক্রয় কর বলে। হিসেব মতো এই কর বিক্রেতার দেওয়ার কথা হলেও বিক্রেতা পণ্যটির দাম বাড়িয়ে তা ক্রেতার ঘাড়ে চালান করে দেয়। বিক্রয় কর তাই এক ধরণের পরোক্ষ কর। ভারতে নানা ধরনের পরোক্ষ কর আছে। বিক্রয় কর ছাড়া অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক, সম্পত্তি কর, মূলধনী কর, মূলধনী-লাভ কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

কর কাঠামো বলতে বোঝায় মোট করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আপেক্ষিক অবদান। এই কাঠামো তাই পরিবর্তনশীল। ভারতেও মোট করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অবদান কমেছে বেড়েছে, তবে মূল কাঠামোটি পালটি যায়নি। পরোক্ষ করের অবদান সবসময়ই বেশি থেকেছে। এই কারণে ভারতের কর কাঠামোটিকে অধোগতিশীল বলা হয়। অধোগতিশীল কর কাঠামো বলতে এমন কর কাঠামোকে বোঝানো হয় যেখানে করের বোঝার বেশির ভাগটাই বহন করতে হয় তাদের, যাদের আয় তুলনামূলকভাবে কম, যারা গরিব। এমনটি তখনই ঘটে যখন পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি হয়, কারণ পরোক্ষ কর ধনী-নির্ধনের তফাৎ করে না। আর গরিব মানুষ যেহেতু তাদের আয়ের বেশিরভাগটাই দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যবহার করে, সেহেতু পরোক্ষ করের বোঝাটিও তাদের ঘাড়েই বেশি চাপে। তবে ভারতের সামগ্রিক কর কাঠামোটি অধোগতিশীল হলেও প্রত্যক্ষ করের কাঠামোটি প্রগতিশীল, মানে যার আয় যত বেশি, তাকে তত বেশি হারে কর দিতে হয়।

ভারতের পরোক্ষ কর কাঠামোর সংস্কার

ভারতের কর কাঠামোটি অধোগতিশীল হলেও, মানে মোট করে পরোক্ষ করের অংশ বেশি হলেও, পরোক্ষ করের কাঠামোটিই অত্যধিক জটিল। এই জটিলতার কারণে যেমন একদিকে একদল মানুষ ভীতিগ্রস্ত হয়ে কর প্রদানের ঝামেলাটি এড়িয়ে চলতে চান, অন্যদিকে তেমনই আরেক দল মানুষ এই জটিলতার সুযোগ নিয়েই কর ফাঁকি দেন। ফলে সামগ্রিকভাবে যেটা হয় তা হল সরকারের কর সংগ্রহের পরিমাণ কমে। ১৯৯০ সালে নয়া আর্থনীতিক নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার উৎপাদনমূলক কাজকর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করে। ফলে সরকারি সংস্থাগুলি থেকে লভ্যাংশ বাবদ সরকারের যে আয় হ'ত তার পরিমাণও কমতে শুরু করে। এই অবস্থায় কার-রাজস্বের উপর বেশি করে নির্ভর করা ছাড়া সরকারের সামনে অন্য কোনও পথ ছিল না। কিন্তু কর কাঠামোর আমূল সংস্কার ছাড়া যে কর সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য কোনও পথ নেই তাও সরকার বেশ বুঝতে পারছিল। এই সময় থেকেই তাই পরোক্ষ কর কাঠামোর সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক রাজা চেল্লাইয়ার নেতৃত্বে একটি কর সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রথম রিপোর্ট টি ছিল অন্তর্বর্তী। সরকারের কাছে সেটি জমা পড়ে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তার চূড়ান্ত রিপোর্টটি কমিটি জমা দেয় দু'টি কিস্তিতে। প্রথমটি ১৯৯২ সালের আগস্টে জমা পড়ে, দ্বিতীয়টি জমা পড়ে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে। কমিটির উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, দুই করেরই কাঠামো সংস্কারের দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আমরা এখানে শুধুমাত্র পরোক্ষ করের বিষয়টিই উল্লেখ করব।

কর কাঠামো সংস্কারের বিষয়ে কমিটির মূল লক্ষ্যটি ছিল কর সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলির জটিলতা সরিয়ে সেগুলিকে যথাসম্ভব সহজসরল করে তোলা এবং কর হারগুলিকে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্য নিয়ে যে সমস্ত সুপারিশ পরোক্ষ কর কাঠামো সম্বন্ধে কমিটি করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হলঃ (১) বহিঃশুল্কের করহারের সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি করহারগুলিকেও কমিয়ে আনা ; (২) অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে মূল্যযুক্ত কর (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) চালু করা ; (৩) পরিষেবা ক্ষেত্রকেও করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সেক্ষেত্রেও ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা।

সরকার চেল্লাইয়া কমিটির সব সুপারিশই মেনে নেয় এবং ধীরে ধীরে কার্যকর করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কার্যকর সুপারিশ অবশ্য চেল্লাইয়া কমিটির রিপোর্টেই ছিল। ১৯৯৪ সালে প্রথম পরিষেবা করের প্রবর্তন করা হয়। আর ২০০২ সালে চালু করা হয় সেন্ট্রাল ভ্যাট বা সেনভ্যাট। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকেও ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করার কথা বললে রাজ্যগুলিও একে একে ভ্যাট প্রবর্তন শুরু করে। প্রথম করে হরিয়ানা, ২০০৩ সালে।

এক দেশ, এক কর

এভাবেই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নতুন কর ব্যবস্থাটিকে, পোশাকি নাম যার গুডস অ্যাণ্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি)। ভারতে জিএসটি প্রবর্তনের কথা প্রথম বলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, ২০০০ সালে। ধারণাটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সে প্রথম চালু করা হয় এই কর ব্যবস্থা। তবে ২০০০ সালে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলেও আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করতেই লেগে যায় আট বছর। ২০০৮ সালে জিএসটি-র কাঠামো তৈরির জন্য গঠন করা হয় এমপাওয়ার্ড কমিটি অফ স্টেট ফিনান্স মিনিস্টারস। এই কমিটি ২০০৯ সালে প্রথম যে খসড়াটি তৈরি করে দিয়েছিল, দীর্ঘ আলোচনার পর সেটিই ঘষেমেজে গ্রহণ করা হল ২০১৭ সালে এসে।

জিএসটি ব্যবস্থা, বলা হচ্ছে, দেশে এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। দু'টি কারণে এই কথা বলা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত দেশে পরোক্ষ করের সংখ্যা ছিল প্রায় পনেরটি-কুড়িটি। এক একটি পণ্যকে উৎপাদকের হাত থেকে উপভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত একাধিক কর দিতে হ'ত। ক্রমশ

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

সম্পাদক সমীপেষু

হাওড়াতে প্রথমবার

হাওড়া সদর লোকসভা আসনে প্রথমবার নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, আজ থেকে ৩৩ বছর আগে। তাঁর বিরুদ্ধে বামপন্থী প্রার্থী হিসাবে ছিলেন সমর মুখার্জী। সালটা ১৯৮৪। আমরা প্রথমবার দেখেছিলাম একটা খোলা জিপে চড়ে মানুষের দরবারে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সমগ্র হাওড়া লোকসভার প্রতিটি গলি থেকে রাজপথ তিনি পরিক্রমা করেছিলেন। মানুষকে সেদিন দেখেছিলাম গলায় মালা পড়িয়ে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের যে ৪২ খানা লোকসভায় ভোট হয়েছিল। সেই লোকসভায় একক ভাবে ১৬ খানা লোকসভা জয়লাভ করেছিল। তার মধ্যে ছিল হাওড়া লোকসভা। তিনি সমর মুখার্জী কে হারিয়ে হওড়া লোকসভার আসনটিতে জয়লাভ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি আরো একবার হাওড়া লোকসভার আসনে জয়লাভ করেছিলেন। হাওড়া জেলার এই লোকসভাটি ছিল বামপন্থী দের দখলে দীর্ঘদিন পর সেই লোকসভা আসনটিও পেয়েছিল কংগ্রেস। আর জয়টা এসেছিল প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির হাতধরে ও কংগ্রেসের টিকিটে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রথমবার খবরটা পেলাম বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে। একজন প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাঁর সব দায়িত্ব পালন করে গেছেন। হাওড়া জেলার বেশ কিছু কাজের জন্য তিনি নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। এখন হাওড়া জেলা লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যেটা বলে গেছেন সেই কথা সতিই শিক্ষনীয়। যা কিছু থাকে সেটাই মূল্যবান। আবার যা কিছু হারিয়ে যায় সেটাও মূল্যবান। আর এই মূল্যবোধ টুকুই আমাদের পথ চলতে সাহায্য করে। সেই মূল্যবোধের পথটাকে দেখিয়ে গেছেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

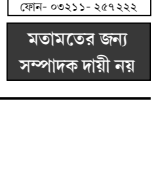

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়